শেষ কৃত্য
অরুন্ধতী রায়চৌধুরী

স্টেশানে নামতে না নামতেই প্রচন্ড ঝড় শুরু হলো। আজ সকাল থেকেই দফায় দফায় প্রাকৃতিক বিদ্রোহে নাজেহাল মানুষ। তিন প্রস্থ ভেজা হয়ে গেছে, চতুর্থ বার ভেজার জন্য প্রস্তুত হলো। ঝলসে উঠছে সন্ধ্যের আকাশ। বাজ পড়ছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে।। স্টেশান চত্বরে সবাই প্রায় টিনের শেডে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু তরকারিওয়ালারা মোটা পলিথিন বিছিয়ে সব্জিগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কুন্তলাও গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়েছিল টিনের শেডের নীচে। বৃষ্টিটা একটু না ধরলে বেরোনো যাবে না। আজ একটু বাজার করে ফিরতেই হবে। তুতানটা মাছ খেতে বড্ড ভালোবাসে তাদের এই স্টেশান বাজার রাত্রি নটা অব্দি জমজমাট থাকে। এলোপাথাড়ি হাওয়া দিচ্ছে খুব। স্কুল থেকে লঞ্চঘাটে আসার সময়ই ছাতার শিক দুটো ভেঙে গেছে – বাবার দেওয়া ছাতাটা ওকে এখন আর আশ্রয় দিতে পারছে না। ওকে গঙ্গা পেরিয়ে স্কুল যেতে হয়। বড্ড উথালি-পাথালি করছিল নৌকাটা। সে একাই মহিলা ছিল জনা ছয়েক যাত্রীর মধ্যে। না, ভয় করেনি তার। উথাল-পাথালের ভয় সে গত তিন বছরে কাটিয়ে উঠেছে। মা বার বার ফোন করছিল। ধরেনি কুন্তলা। গুচ্ছের মিথ্যে কথা বলতে হত। এইমাসেই বাবা মারা গেছিল গতবছর, পাঁচই জুলাই। আজ সতেরো। তিথি মতে বাৎসরিক কাজ হয়ে গেছে বাবার। কুন্তলাই করেছে। তবু মায়ের ভয় যায় না।
-তোর ওপর বড্ড টান ছিল মানুষটার...বছর না কাটলে স্বস্তি পাই না। ভয় লাগে। মায়ের এই ভয় ভাঙানোর চেষ্টা করেনি ও। তবু ভয়টা তো আছে সম্বলের মতো। তার তো কিছুই নেই নৌকা পার হয়ে, এপারে এসে ট্রেনে উঠেই মাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা, করেছিল কুন্তলা, পারেনি। দুর্যোগের ইঙ্গিতেই তাদের ওখানকার কারেন্ট চলে যায়। অটোগুলো যেতে চায় না। রিক্সা তিনগুন ভাড়া চায়। আজ বাজার নিয়ে ফিরবে বলে সাইকেলটা আনেনি কুন্তলা। খুব কাছাকাছি একটা ভীষণ জোরে বাজ পড়ল। আলোর ঝলকানিতেই আরও একটু ভেতরে ঢুকে এসেছিল ও। তখনই গন্ধটা পেল। বড়ও তীব্র এই পাউডারের গন্ধটা। এখনও নাকে এলে গা গুলিয়ে ওঠে। বাবার দীর্ঘ রোগশয্যার এই পাউডারটাই ছড়ানো হতো বাবার বিছানায়, চারবেলা। ঘরে সবসময় ন্যাপথালিন রাখা। দিদির বিয়ে হবার পর থেকেই বাবার এই অসুখটা উপসর্গ দেখা দেয. তুতানটা তখন মাস তিনেকের বাবা ধীরে ধীরে শয্যাশায়ী হয়ে গেল। শেষ একবছর বড্ড কষ্ট পেয়েছে বাবা। চোখের পাতা ফেলে হ্যাঁ-না বোঝাত বাবা, তাও অতি কষ্টে। অনেক সময় গোঙ্গানোর মতো শব্দ করে সাড়া দিত। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্দ্র যে এত ভয়ঙ্কর ভাবে বিদ্রোহ করতে পারে, জানা ছিল না ওদের। বাবার কাছে গেলেই সেই জেহাদী সুরটা শুনতে পেত কুন্তলা। গলা থেকে মিহি ক্ষীণ একটা শব্দ ভেসে আসত। বাবার তানপুরা, হারমোনিয়াম পরিষ্কার করার সময় এখন সেই সুরটা স্পষ্ট শুনতে পায়ও। আর বাবার শেখানো আবাল্যের স্বরলিপি একটুও অবশিষ্ট নেই ওর কাছে। মুখাগ্নি করার সময় সবই গুরুদক্ষিণায় দাহ করে এসেছে কুন্তলা। বাবার কাছেই তাদের দুই বোনের গান শেখা। দিদি পরে অতুল মাষ্টারের কাছে যেত নজরুলগীতি শিখতে। কুন্তলার প্রয়োজন হয়নি। বাবার সঙ্গে থেকেই ও শিখেছিল রবীন্দ্র সাধনা আর বাগান করা। বাবা অসুস্থ হবার পর থেকেই হারিয়ে যেতে থাকে সেই সুরের পথ। এখন আর মনেও নেই সে সময় পথের কথা। মনে রাখার কষ্ট ও আর সহ্য করতে পারে না। দিদি অনেকবার বুঝিয়েছে,
-অতো জড়িয়ে পড়িস না বুবু ...টিকতে পারবি না।
-তুই পারবি দিদি?
-খুব কষ্ট হবে, তবু বোধহয় পারবো। আমাকে জড়িয়ে আছে তুতান তোর অক্তুদা, শ্বশর-শাশুড়ি-একটা গোটা সংসার। আমাকে বোধহয় ওরাই টিকিয়ে দেবে।
বাবাকে চামচ দিয়ে ফলের রস খাওয়াতে একটু হেসেই বলেছিল ও,
-আমাকেও টিকিয়ে দেবে –এই দুটো বুড়ো বুড়ি। একজন একজন করে যাবে- আর আমি রোজ এদের চন্দন পরাব, মালা পরাবো, সামনে কাঁচের প্লেটে খান চারেক সন্দেশ রাখব, পাশে রাখব কাচের গ্লাসে ঢাকা দেওয়া জল। সকালের সন্দেশগুলো সন্ধেতে বিলিয়ে দেব পাখিদের...আর রাতেরটা সকালে।
দিদি ওর মুখ চেপে ধরেছিল। কাঁদতেও ভুলে গেছিল বোধহয়। মা যে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, টের পায়নি কুন্তলা। মা কাঁদেনি। বলেনি। কোনো অস্বাভাবিক আচরণ করেনি। ঘরে ধূপ ঘুরিয়ে, রান্না ঘরে চলে গেছিল।

বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। এইবার না বেরোলেই নয়। এরপর আর টাটকা মাছ পাওয়া যাবে না। দিদি এখন থাকবে সপ্তাহখানেক। অক্তুদা অফিস ট্যুরে নাসিক গেছে। এরপর দিদিও চলে যাবে ভুতানকে নিয়ে। অন্য একটা ভালো

চাকরির অফার পেয়েছে অন্তুদা। খুব নামি কোম্পানি, ভালো মাইনে। দিদির জড়িয়ে থাকা সংসারটা বেশ সুন্দর সমীকরণে চলে। অন্তুদাদের বাড়ি নবীনপল্লীতে, ওদের বাড়ি থেকে সাইকেলে মিনিট কুড়ি সময় লাগে। অন্তুদার মা-বাবা দুজনেই ভীষণ সজ্জন মানুষ। দিদি যে মাঝে মাঝেই এসে এখানে থাকে, কখনও আপত্তি করেননি। আর মেসোমশাইয়ের কাছে কুন্তলা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। ওই না দিলে শেখর রায়ের অত্যাধুনিক হিলিং টাচ থেকে বাবাকে মুক্ত করা যেত না। আরও কত মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ কুন্তলা। জীবনকাকু, ওর স্কুলের ক্যাশিয়ার রঞ্জিতদা...। এমনকি শেখরের কাছেও কিছু কম কৃতজ্ঞ নয় কুন্তলা। অন্তুদার বন্ধু, বাবার একসময়ের গানের ছাত্র ডাক্তার শেখর রায়ই প্রথম দেখেছিল বাবাকে। এই ভয়ানক অসুখটা সদ্য ধরা পড়ায় দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল ওরা। ডঃ শেখর রায়, কুন্তলা যাকে মাস ছয়েকের মধ্যেই শুধু শেখর ডাকার সম্পর্ক পেয়েছিল, সেই পরম যত্নে ওদের প্রত্যেকের আস্থা কুড়িয়ে নিয়েছিল। কেউ কেউ থাকে, যারা নির্ভরতা অর্জন করতে পারে সহজেই। তারাই বোধহয় ডাক্তার হিসেবে বেশ সফল হয়। বেশ দ্রুত নাম করতে পারে। কামিনী – কাঞ্চন – যশের ত্রয়োস্পর্শে তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তারপর জানা যায় হিলিং টাচ শেখরের নিজের নার্সিংহোম। শেখর মাকড়সার মতো জড়িয়ে নেয় ওদের নির্ভরতা, জড়িয়ে নেয় বাবার নানা স্নায়বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে। বাবার জমানো টাকা দিদির বিয়ের পরই তলানিতে ঠেকেছিল। এরপর হিলিং টাচে ভর্তি করার পর বাবার চিকিৎসায় ওদের নাভিশ্বাস উঠছিল। তবুও নির্ভরতা কাটাতে পারেনি কুন্তলা। নার্সিং হোমের লাগোয়া ওষুধের দোকানে রোজ ফর্দ বাড়ে। সেদিনও উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওষুধ কিনে ফিরছিল কুন্তলা। স্কুলের মাইনেতে শুধুই তলানি দেখছিলও। বেসরকারি স্কুলে এর থেকে বেশি কিছু আশাও করা যায় না। এর আগে তো কখনও ধার দেনায় চলেনি তাদের ছোট্ট সংসার, তাই ধার করার ভাষাটাও জানা ছিল না ওর। বাবাকে এখন রাইস টিউবে খাওয়ানোর একটা অমানুষিক প্রচেষ্টা চলছে। বাবা খেতে পারছে না। এখন ওর মনে হয়, সেই সময় থেকেই বোধহয় বাবার পিন্ডদান শুরু হয়ে গিয়েছিল। খাওয়ানোর পদ্ধধি দেখে শিউরে উঠেছিল কুন্তলা। মা রোজ আসতে পারত না, বাতের ব্যথায় প্রায় পঙ্গু মা। তাছাড়া দুজুনের যাতায়াতের খরচটাও ভাবতে হচ্ছিল। দিদির ছেলেটা তখন মাস ছয়েকের। তুতান হবার পর, প্রায় বছর খানেক দিদি খুব ভুগেছিল। ডাক্তার বেডরেস্টের ফরমান জারি করে দিদিকেও তখন ওর পাশ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। নার্সিং হোমের ওপিড়ি তে সুসজ্জিত বসার জায়গা আছে। সেখানেই একটা চেয়ারে বসে টাকার হিসেব করছিল কুন্তলা। বাড়ির পেছনের দিকের জমিটা বোধহয় আর রাখা যাবে না। বাবার মুখে শোনা, ঠাকুরদার অমতে বিয়ে করেছিল বলে পিতৃদত্ত সম্পত্তির কিছুই পায়নি বাবা। ঠাকুরদা দিলেও বাবা নিত না। নিজেই কষ্ট করে তিনকাঠা জমি কিনেছিল। সামনে পিছনে বাগান আর মাঝখানে তাদের একতলা বাড়ি। কুন্তলা যখন ক্লাস ফোরে, তখন টালির ছাদ পাকা হলো। আর বি.এ পাশের পর ছাদের ঘরটা। অনেক কষ্টে ছাদের ঘরটা বানিয়েছিল বাবা, তাদের দুই বোনের জন্যে। দিদি থাকত না ওই ঘরে, ঘরটা তারই হয়ে গেছিল। এখন বোধহয় সবই দিয়ে দিতে হবে প্রমোটারের হাতে। অন্তুদার এক অবাঙালি বন্ধুতো মুখিয়ে আছে গ্রাস করার জন্য। বুকটা মুচড়ে উঠেছিল ওর। তার ঘরটার প্রত্যেকটা ইঁট গাঁথুনির সঙ্গে মিশে আছে বাবার হাতের ছাপ। তার তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা, বইয়ের আলমারি দিয়ে সাজিয়েছিল ঘরটাকে। খাট বানানোর জেদও ধরেছিল বাবা। সবাই মিলে বকে-ঝকে নিরস্ত করেছিল বাবাকে। একটা তক্তাপোশেই তার বিলাস-স্বপ্নের আয়োজন করেছিল কুন্তলা। জানলা দিয়ে উঁকি দেয় বাবার হাতে লাগানো কদম গাছটা। বর্ষায় কদমের গন্ধে ভরে ওঠে ঘরটা। পুব-দক্ষিণ-খোলা ঘরটার লাগোয়া ছাদের অবুঝ আবদারে মাঝে মাঝেই গানের আসর বসত। পেশায় কেরানী ছিল বাবা, কিন্তু পাড়ার সবাই ডাকত মাস্টার মশাই বলে। বাবা গান শেখাত, তবে পেশাদারী ছিল না সেই দীক্ষা। গানের মতো গান বয়ে যেত, যোগ-বিয়োগে ঝুটত এসে পাড়া-বেপাড়ার ছেলে-মেয়েরা। রবিঠাকুরের গান নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে গেছে বাবা। গবেষণা শব্দটাকে বার বার সংশোধন করে দিত বাবা। বলত – এ সাধনা। গবেষণার কলকব্জায় না-ই বা ঢোকালি।

শনি-রবি তো বটেই যে দিনই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরত বাবা, বসত গানের আসর। শতরঞ্জি, মাদুর বিছিয়ে বসে যে তারা, যারা বাবাকে মাস্টারমশাই ডাকত। তাদের অনেককেই চেনে না কুন্তলা। সে খুব একটা মিশুকে নয়। সবার সামনে গাইতে বললে ও রেগে যেত বাবার ওপর। গানের মাঝে মাঝে গানেরই আড্ডা জমত, মা মুড়ি মেখে দিত সবাইকে। লুচি আলুর দমের ফিস্টও হতো শীত কালে। তখন ও সদ্য স্কুলের চাকরিটা পেয়েছে। যাতায়াতের পরিশ্রমে অভ্যস্ত করতে পারেনি নিজেকে। তার সব শ্রান্তি ধুইয়ে দিত ওই গানের আসর। এক-একটা গান কী ভীষণ জীবন্ত করে রেখেছে মুহূর্তগুলোকে। তখন ও বি.এড করছে। কোন একটা বিয়ে বাড়ি যাবার কথা সেদিন। কুন্তলার পর্যাকটিস টিচিং চলছিল বলে ও সে যাত্রায় নিষ্কৃতি পেয়েছিল। নীচে মা আর দিদি অনেকক্ষণ সেজেগুজে তৈরী, অথচ বাবার কোনও হুশই নেই। জমিয়ে চলছে গানের আসর। তখন রাত্রি আটটা বেজে গেছে, আর সেদিনই যেন বাবাকে গানে পেয়েছে। বহুক্ষণ অপেক্ষার পর মা রুদ্রমূর্তিতে ছাদে উঠে এসেছিল। ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল মাকে। টিউশানির টাকা জমিয়ে তারা দুইবোন মাকে একটা কাঁথাস্টিচের শাড়ি কিনে দিয়েছিল। গ্রে আর

লাল রঙের সুতোর বুনোনে মায়ের ফর্সা রঙটাকে যেন ধরে রাখতে পারছিল না। ভিষণ সুন্দর মানিয়েছিল মাকে। সেই রূপের রুদ্রমূর্তি দেখে ওরা সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল গান। তখনই বাবার কোন এক ফিচেল শিষ্য গেয়ে উঠছিল,
-আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী...
ব্যাস। তারপরের সমবেত কন্ঠে সবাই। প্রত্যেকবার ওগো মা...আ.. এর টানে বাবার একক কন্ঠস্বর। রাগে লজ্জায় লাল হয়ে মা কুন্তলার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। বিড়বিড় করছিল।
-বুড়ো বয়েসে ভিমরতি। বিয়ের যুগ্যি দুটো মেয়ে বাপ্, তার মতিটা একবার দেখ। ছিঃ ছিঃ এতগুলো ছেলে মেয়ের সামনে...
কুন্তলা পরের দিনের লেসেন প্ল্যান লিখতে লিখতে ছাদের সমবেত সুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছিল,
"কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি...
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি।"...
বাউল আঙ্গিকের রবীন্দ্রগীতিতে সেই বিভাস রাগ মায়ের রাগের ভাষা ভুলিয়ে দিয়েছিল। একতারা বাজাচ্ছিল অক্তদা। সেদিন বিয়েবাড়ি যাবার বদলে, বিয়ের আয়োজন ঘনিয়ে এসেছিল ওদের বাড়িতে। এক তাদের দিদি আর অক্তদা সুন্দর বাঁধা পড়েছিল। এর একবছরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল দিদির। বাবার পি.এফ. এর সিংহভাগ টাকা তুলে, মায়ের অর্ধেক গয়না ভাঙিয়ে দিদি অক্তদা দুজনেই বার বার বারণ করেছিল। বাবা কথা শোনেনি। বাবাকে কথা শোনানো যেত না। আজও যায় না। ঠাকুরদা মারা যাবার সময় দেশের বাড়ির প্রায় পাঁচ কাঠা জমি বাবার নামে লিখে দিয়েছিল। দুই পিসির কেউই ঠাকুমার দায়িত্ব নিতে পারেনি। বাবা নিয়ে এসেছিল ঠাকুমাকে। তখন কুন্তলা নেহাতই শিশু। ফোর-ফাইভে পড়ে। পরে মা-ঠাকুমার এই একটা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন বাবাকে জিজ্ঞাসা করা যেত না। কুন্তলা একবার তবু প্রসঙ্গটা তুলেছিল, বাবা তখন মুগ্ধ হয়ে ওর ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে কদম গাছটাকে দেখছে। বাইরে আঝোরে বৃষ্টি নেমেছে, সূর্যি ঠাকুর পাটে যাচ্ছেন...এমন সময় পুরুলিয়ার জমির প্রশ্ন। বাবা খুব শান্ত গলায় উত্তর দিয়েছিল,
-একটা স্কুলকে দান করেছি।
-ভালো করেছ। আমায় একবার নিয়ে যাবে?
-যাব
উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর, নিয়ে গিয়েছিল বাবা। স্কুলের চেহারা দেখে আবাক হয়ে গিয়েছিল কুন্তলা। শাল, পলাশের জঙ্গলে ঘেরা একটা গ্রাম। চারদিকে শুধুই রিক্ততা, তবু ভীষণ সুন্দর, একটা বড় উঠোন ঘিরে মাটির ঘরের সারি। সেগুলোই নাকি ক্লাসরুম। একটা টিউবয়েল আছে উঠানের একপাশে একটা দুটো বাচ্চা ছেলে হাতলটায় বসে চাপ দিচ্ছে, আর মেয়েগুলো কলাইয়ের জগে জল ভরছে। গরমে না কি তাও পাওয়া যায় না। তখন ভোর বেলা ইস্কুল বসে। স্কুল ছুটির পর মাটির ঘরের লাগোয়া তিনটে চৌবাচ্চায় জল ভরার খেলা খেলে স্কুল পড়ুয়ারা। চৌবাচ্চাগুলো তাদের পরের দিনের জলের সঞ্চয়। মাইল দুই পথ হেঁটে ওরা টিনের পাত্রে জল বয়ে আনে। ওদের বাপ-মাও আনে ফুরসত পেলে। চৌবাচ্চাগুলো আবার অ্যাসবেস্টাস দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখে। বিজলি বাতির তো প্রশ্নই ওঠে না। ইস্কুলের পেছন দিকে। সেই প্রথম লালচে মাটির দোতলা বাড়ি দেখেছিল কুন্তলা। মহিলাকে খুব অন্যরকম লেগেছিল ওর। অনেক কষ্টে সে বছরই ক্লাস এইট পর্যন্ত অ্যাফিলিয়েশান পেয়েছে স্কুলটা। কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে ফেলেছিল কুন্তলা।
-ওরা মাধ্যমিক দেবে না?
হেসে ফেলেছিলেন যামিনী। বলেছিলেন।
-মাস্টারমশাই আপনার এই মেয়েটাকে আমার লাগবে। দেবেন?
বাবাও হাসছিল। বলেছিল,
-ও নিজেই আসবে একদিন। সত্যকাম কোথায়?
-কলকাতায় গেছে। এই স্কুলটাকে নিয়ে বড্ড ছোটাছুটি করছে। কতদূর পারবে জানি না। আপনার জন্য দুটো বই রেখে গেছে।
-বহুকাল দেখি না ওকে।
-এইবারই যেত। আপনি আসবেন শুনে বই দুটো রেখে গেল।
সেদিন ওরা ফিরতে পারেনি। চারিদিকে ভীষণ গন্ডগোল হচ্ছিল। পুলিশ নাকি চিরুনি তাল্লাসি চালাচ্ছে। সেই ভোররাতে বর্ষা নেমেছিল আচমকাই। কাউকেই বলতে হয়নি, কুন্তলা বৃষ্টিকে শুনিয়েছিল বুঝি...

বন্ধু, রহো রহো সাথে।
আজি এ সঘন শ্রাবনপ্রাতে।
পরদিন সকালে চলে এসেছিল ওরা। মাস তিনেক পরেই সন্ধ্যেবেলা ওর ঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলে দেখে বাবা, চুপ করে বসে আছে। ও পাশে যেতেই
-যামিনী নেই। কাল রাতে মারা গেছে।
-কীভাবে?
-স্ট্রোক। সময় পায়নি ছেলেটা, মাকে দাহ করে আমায় জানাল। শেষ দেখা যে মানুষের কখন কীভাবে ঘটে য়ায়।
-ওরা কি ওখানেই থাকে বাবা?
-বছর পনেরো ধরে ওখানেই থাকে। নবীন পল্লীতে ওদের নিজেদের বাড়ি আছে। মাঝে মাঝে ছেলেটা আসে। দিন কয়েক থাকে। এদিকের কাজকর্ম সামলে আমবার চলে যায়।
-একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা?
-কী?
-ওদের চলে কীভাবে?
-বোধিসত্ব নামে কোনো সাহিত্যিককে চিনিস?
-চিনি। তবে বিশেষ পড়িনি। খুব কঠিন লাগে।
-ওদেরও তাই কঠিনভাবেই চলে। একটা প্রাইমারি স্কুলে বছরখানেক হলো চাকরি পেয়েছে ছেলেটা। চালিয়ে নেয়। নিজের চোখেই তো দেখলি কীভাবে কত সহজেই কঠিনে চালানো য়ায়।

২.
সব্জির বাজারে যেন আগুন লেগেছে। কোনো কিছুই হাত দেওয়া যাচ্ছে না। বাবা কতরকমের সব্জি লাগাতো বাড়ির পেছনদিকের জমিটাতে। কতদিন সে দিকে নজর দেবার অবসর পায়নি কুন্তলা। বাজারে নিতাইদার সঙ্গে পাইকারি দরে আলু চিচিঙ্গে কখনও সোয়াবিনের বীজ কিনে নিজেই দিয়ে আসত পুরুলিয়ায় কখনও আবার নবীন পল্লীতেও পাঠিয়ে দিত। কুন্তলা অনেক চেষ্টা করেও ছেলেটার মুখটা মনে করতে পারে না। হয়ত য়খন এসেছে, কুন্তলা তখন কলেজে বা স্কুলে। এত ভারি বস্তা একা নিয়ে যেতে বারন করত মা। বাবা শুনত না। জীবনকাকু মাঝে মাঝে যেত। কী যে অমানুষিক পরিশ্রম করত বাবা। সেই জন্যই কী এই মারণব্যাধি ধরল বাবাকে? হিলিংটাচে সে দিন বসে আরও কত কি কারণ ঠাওরাচ্ছিল কুন্তলা। বাবাকে দেখছিলেন ডঃ চৌধুরী। এ অঞ্চলের নামকরা নিউরোলজিস্ট। তিনি বলে দিয়েছিলেন, আরও চারটে টেস্ট করাতে হবে। নাহলে না কি সিদ্ধান্তে আসতে পারা যাচ্ছিল না। এদিকে শেখরের সঙ্গে কথা বলার আবকাশ ক্রমশই ফুরিয়ে আসছিল। জামাইয়ের বন্ধু, এককালে বাবার কাছে গান শিখতে আসত ইত্যাদি জীর্ণ আন্তরিকতার মোড়ক খসিয়ে খসিয়ে দিচ্ছিল হিলিংটাচ এর চোখ ধাঁধানো চিকিৎসার প্যাকেজ। ভাঙনের ভয় আবসাদ কোনোটাই ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ পায়নি কুন্তলার মধ্যে। শেখর খুব স্পষ্ট উচ্চারণে বুঝিয়েছিল,
-এই অসুখটা অনেকক্ষেত্রই জেনেটিক হয়। আমার মায়েরও পারকিনসন্স্ আছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের রিস্ক নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।
কুন্তলা বুদ্ধিমানদের মতো কাজটাই করেছিল। ডাক্তারি পরিভাগে ঢেকে দিয়েছিল সব প্রত্যাশাকে। নার্সিং হোমের লবিতে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল কুন্ডলা। অত্যাধুনিক কেতাদুরস্ত নার্সিংহোমে মাইক্রোফোনে তখনই শুনেছিল ও।
-মিঃ সুধীর মজুমদারের বাড়ির লোক, কাউন্টারে আসবেন।
এ.সি তে বসেও ঘাম দিচ্ছিল কুন্তলার। তার কছে পড়ে রয়েছে মাত্র পাঁচশ টাকা। অন্তদা টাকা পাঠিয়েছে, কিন্তু সাইবার বিভ্রাটে ওর অ্যাকাউন্টে তখনও ঢোকেনি। কাউন্টারের কাছে দাঁড়াতেই সুন্দরী মেয়েটা একটু অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলেছিল,
-কিছু মনে করবেন না ম্যাম, একটু অগেই আপনি যে পাঁচ হাজার টাকা পে করেছেন, তার মধ্যে দুটো পাঁচশর নোট জাল।
-মানে? আপনারা তো চেক করে নিলেন?
-এই কাউন্টারে শুধু অ্যামাউন্টটা চেক করা হয়। তারপর আপনার স্লিপে টাকাটা পাশের কাউন্টারে দেওয়া হয়েছিল-সেটাই নিয়ম। সেখানেই ধরা পরেছে ব্যাপারটা। আপনি কি এখন নোট দুটো বদলে দিতে পারবেন?
-না। আমি তো আজ আর টাকা আনিনি। কিন্তু জাল নোট কীভাবে এল?

-সেটা তো আমরা বলতে পারব না। সেক্ষেত্রে আপনার আজকের এই এক হাজারটাকা ডিউ বিলের সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাচ্ছ|অ্যামাউন্ট ফিফ্টিন থাউস্যান্ড।

কুন্তলা ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে? পনেরো হাজার টাকা সে জোগাড় করবে কোথা থেকে। স্কুল থেকে দশ হাজার লোন নেওয়া হয়ে গেছে। ক্যাশিয়ার রঞ্জিতদা আর ম্যানেজ করতে পারবে না। সবথেকে বড় সমস্যা এখন জাল নোট দুটোকে নিয়ে। চারহাজার সে এ.টি.এম থেকে তুলেছিল, আর এক হাজার স্কুলের মাইনে থেকে জুড়ে মোট পাঁচ হাজারের বিল মিটিয়েছিল। রঞ্জিতদাকে বললেই নোট দুটো বদলে দেবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তো তাও সম্ভব ছিল না। পরদিন রবিবার, স্কুল বন্ধ। লজ্জার মাথা খেয়ে একবার শেখরকে জানাবে ব্যাপারটা? বেশিক্ষণ চিন্তা করেনি কুন্তলা।

শেখরকে ফোন করেছিল। এ সময়টায় ডাক্তাররা লাঞ্চ সারে। তিনবারের বার ফোনটা ধরেছিল শেখর| নীচে নেমে এসে ওকে এক হাজার টাকার একটা নোট দিয়ে গিয়েছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই দিয়েছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই বলেছিল।

-এই ব্যাপারগুলো এবার থেকে একটু খেয়াল রেখ। একেই তো আমার রেফারেন্সে কেসটা আছে বলে টোয়েন্টি পাসেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছ নার্সিং হোম| তারপর যদি আবার জাল নোট দাও...

-আমি ইচ্ছে করে জাল নোট দিয়েছি?

-তা কেন? চেক না করে দিয়েছ – সর্ট অফ নেগ্লিজেন্স ছাড়া আর কী বলব। আর প্লিজ এই টাকাটা ফেরত দিতে এসো না।

-সেটা হয় না।

-বেশি সেন্টি দিও না তো। কিছু খেয়েছ? বিস্কিট কেক সঙ্গে না থাকলে এখানে একটা স্ন্যাক্সবার আছে। খেয়ে নিও। আমাকে রাউন্ডে যেতে হবে।

টাকাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কুন্তলা। এক হাতে দুটো পাঁচশ টাকার নোট, অন্য হাতে শেখরের দেওয়া হাজার টাকার একটা কড়কড়ে নোট। দুটোই তো জাল। কাউন্টারে আর জমা দিয়ে লাভ কি? রাতে বরং জীবনকাকুর কাছ থেকে ধার করবে ও হাজার টাকা। সোমবার স্কুলে গিয়ে রঞ্জিতদার কাছ থেকে বদলে আনবে তার জাল দুটো নোট। শেখরের টাকাটা আজই ফেরত দিতে হবে। তখনই আবার ঘোষণা শুনেছিল ও,

-সুধীর মজুমদারের বাড়ির লোক ডঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করবেন।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে নিজেকে আরও বিধ্বস্ত মনে হয়েছিল কুন্তলার। বাবার জন্য আরও কুড়ি হাজার টাকার যোগান দিতে হবে দিন তিনেকের মধ্যে। না হলে টেস্টগুলো হবে না। অথচ নার্সিং হোমে ভর্তির আগেই এম.আর.আই, সিটি স্ক্যান সহ আরও তিনটে নিউরোলজিক্যাল টেস্ট করিয়েছিল শেখর। সে গুলো কি ওর মতোই গুরুত্ব হারিয়েছে? না কি, রিপোর্ট করাগুলো ঠিকমতো চেক করা হয় পাঁচশ টাকার নোট দুটোর মতো? মনোস্থির করে ফেলেছিল কুন্তলা, সেদিনই বন্ডে সই করে বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে ও। বাড়িতেজানালেই নানা মতবিরোধ উঠত। সুতরাং জানানোর দরকার নেই। নার্সিংহোমটা ওদের বাড়ি থেকে ঘন্টা দেড়েকের পথ। অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া তো বাবাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ওটা জোগাড় করাই মুস্কিল। নার্সিং হোমের লাগোয়া ওষুধের দোকানে গিয়েছিল কুন্তলাষ যদি একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা যায়। ওর সব কথা শুনে দোকানদার প্রথমেই নাকচ করেদিল। কুন্তলা তখনও অনুনয় বিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। ওর পাশে দাঁড়ানো একটা ছেলে নাইলনের ব্যাগ থার্মোকলের বাক্সে মোড়া ওঘুধ ঢোকাতে ঢোকাতে বলল,

-রাজুদার গাড়িটা পাওয়া যাবে না যোগেন কাকু?

দোকানদার প্রায় খিঁচিয়ে উত্তর দিল,

-ওটা অ্যাম্বুলেন্স না কি? শবযান। আর উনি তো বলছেন বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা। তোর যেমন বুদ্ধি।

-ছাড়তো। শবযান। কালোটাকা বাঁচাতে নার্সিং হোমে সাজিয়ে রেখেছে গাড়িটা। সবই কি এমনি এমনি? কোথায় শবযান লেখা আছে গাড়িটায় বলতো? সামনে পেছনে ফ্লেক্সের বোর্ড ঝোলানো-ক্ষনে শবযান ক্ষনে সেবাযান।

-বেশি বুঝিস বলেই তো তোকে নিয়ে ঝামেলা।

-দ্যাখো দ্যাখো। ফোন করো না একটা? রাজুদার গাড়িটা শেডের নীচে তো দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে।

বলেই কুন্তলার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল,

-আপনার অসুবিধে নেই তো?

কুন্ডলা সম্মতি জানিয়েছিল। তখন সে শবযান আর সেবাযান এর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছিল না। ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। হয়তো সবাই তাকে দুষবে। কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত দোষ-গুণের উর্দ্ধেই নিতে

হয়। কুন্তলাও তাই নিয়েছিল। দোকানের যাগেনবাবু ফোন করে গাড়ি ঠিক করেছেন। কুন্তলাওর বাড়ির ঠিকানা বলল। ফোন রেখে যোগেনবাবু বললেন,
-বারশ টাকা লাগবে। আর বিকেল চারটের আগে গাড়ি পাওয়া যাবে না। ড্রাইভার নেই।
পাশের ছেলেটি চমকে উঠে বলেছিল, -ডাকাত একটা। এভাবে পরিস্থিতির সুযোগ নাও তোমরা, বুঝলে যোগেন কাকা। যতই হাতে রতিভরে আংটি পরো, কিস্যু হবে না।
-আমার বাপান্ত করছিস কেন সত্য? আমি তো নিমিত্তমাত্র। কিছুক্ষণ আগেই উনি ওষুধ নিয়ে গেছেন। এখন বলছেন বন্ডে সই করে পেশেন্টকে নিয়ে চলে যাবেন। হুট করলেই ব্যবস্থা হয়?
-দরকার পড়লে নেবেন বই কি। ব্যবস্থা রাখার দায়িত্ব তোমাদের
-ওরে আমি এখানকার কর্মচারীরে, মালিক নই।
-নিজেরও মালিক নও।
সেই অসম্ভব ঝগড়ুটে সত্যবাদিটি নাইলনের ব্যাগটা সাইকেলের হাতলে ঝুলিয়ে উঠে পড়ল। কী একটা ভেবে ওর দিকে ফিরে বলেছিল,
-সামলে নিতে পারবেন তো? ড্রাইভারের নাম রূপেশ।
আপনার মোবাইল নাম্বারটা যোগেনকাকুকে দিয়ে দিন, ড্রাইভার এসে গেলে উনিই আপনাকে জানিয়ে দেবেন। তাছাড়া ফর্মালিস্টি সারতে সারতে এমনিতেও চারটে বেজে যাবে। আই.সি-ইউ তে আছেন বললেন, আপনার বাবা, ছাড়তে একটু বেশিই ঝামেলা করবে।
-করুক। বু বাবাকে আর এখানে রাখা যাবে না।
যোগেনবাবু কী যেন একটা মনে পড়ায় বলেছিলেন,
-একবছরপর এলি, নারে সত্য? মুম্বাইতে কোথায় ছিলি?
-ধারাবি বোঝো? বস্তিতে। ওখানেই তো ক্যাম্পেনিং করলাম। আজই তো এলাম।
-তোর চাকরিটা আছে? না গেছে?
-দিব্য আছে। সরকার বড্ড ভালোবাসে যে।
সত্য আর দাঁড়ালো না। সাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে গেল। কুন্তলা আকাশভাঙা দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এসেছিল নাসিং হোমে। বন্ডে সই করে নিয়েতো যাবে, পেমেন্ট করবে কীভাবে? জীবনকাকুকে ফোন করবে? তার আগে রিশেপসানের ওই মেয়েটাকে জানাতে হবে। ফর্মালিটির বহরটা না জানলে শুধু শুধু ফোন করে লাভ নেই। রিসেপশানিস্ট মেয়েটি ওর কথা শুনে হতবম্ব হয়ে গিয়েছিল। বেশ যান্ত্রিক গলায় বলেছিল।
-ডঃ শেখর রায়ের রেফারেন্সে এসেছেন যখন, উনার পারমিশান লাগবে। তাছাড়া ডঃ চৌধুরীর সঙ্গেও আপনাকে কথা বলতে হবে। ডঃ চৌধুরীতে বেরিয়ে গেছেন, সন্ধ্যে দুটা নাগাদ আসবেন। অপেক্ষা করুন। আমি ডক্টর রায়ের সঙ্গে কথা বলছি।
শেখর নেমে এসেছিল ঘন্টাঘানেক পরে। সামান্য সহানুভূতি দিয়ে বলেছিল,
-এত ইমম্যাচিওর্ডের মতো ডিসিশান নিচ্ছ কেন বলত? বাড়িতে এই পেশেন্টের চিকিৎসা হয়?
-এখানেও হয় না।
-বাজে কথা বলবে না একদম। বেশি লাই পেয়ে গেছ, না? এত সস্তায় এরকম এক্সপেনসিভ ট্রিটমেন্ট আর কোথায় করাবে? তোমার বাড়িতে? হোমিওপ্যাথি করে? একতারা না কি তানপুরায় গান শুনিয়ে? যত্তসব...
-আমি বাবাকে আজ এখান থেকে নিয়ে যাব। তোমার ডিসিশান তো চাইনি।
-পনেরো হাজার টাকা ডাউনপেমেন্ট করে নিয়ে যেও। এই টাকাটাও কি দিয়ে যাব?
-লাগবে না।
চিরকাল ঈশ্বরে বিশ্বাসী কুন্তলা। সেদিন আর ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার কথা মনে হয়নি। নিজেকেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল। শেখর চলে যেতেই জীবনকাকুকে পৌছাতে গেছে ওই ইস্কুলটাতে। ভীষণ অসহায় লাগছিল কুন্তলার। জীবনকাকুই বলল,
-দাঁড়া। ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোর নাম্বারটা আমি সত্যকে দিচ্ছি। ও আমাদের পাড়াতেই আছে এখন। চিন্তা করিস না। নমটা শুনে চনকে উঠেছিল কুন্তলা। ওই ছেলেটা নয় তো? নিতান্ত অপরিচিত একজন তাকে টাকা দেবে। কুন্তলার সেদিন মনে হয়েছিল গরীবের লজ্জা-বিলাস থাকতে নেই। যেভাবেই হোক আজ ও বাবাকে এখান থেকে নিয়ে যাবেই। রাইস টিউব দিয়ে বাবাকে খাওয়ানোর মমত্বহীন দৃশ্যটা ভুলতে পারছিল না কুন্তলা। এত নৃশং সভাবে মানুষকে বুঝি বিষত্ত খাওয়ানো যায় না। বিকেল চারটে নাগাদ যোগেন বাবু জানালেন রূপেশ ড্রাইভার হাজির। কুন্তলার আরও দেরি হবে শুনে সে বেশ বিরক্তই হলো। হোক বিরক্ত, এখন এসব গায়ে মাখলে চলবে না। কিন্তু পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সে একেবারে জেহাদ ঘোষণা করল। সে আর যেতে পারবে না, তার অন্য ভাড়া আছে।

সত্য তখনও এসে পৌঁছয়নি। উপায় না দেখে কুন্তলা আবার যোগেনবাবুর শরণাপন্ন হয়েছিল। বয়স্ক ভদ্রলোক। হয়ত একা একটা মেয়ে সকাল থেকে নাকানি চোবানি খাচ্ছে দেখে মায়া হয়েছিল।
-দেখছি। তুমি ভেব না।
একটা দিন তার সুক্ষ স্নায়ুতে কতরকমের সংবেদন লুকিয়ে রাখে। কত অপরিচিত মানুষ সুহৃদ হয়ে যায় – কত চেনা মুখ মুখোশ খুলে ফেলে...। ডাক্তার চৌধুরীর চেম্বারে যাওয়ার মুখে ডাকটা শুনতে পেয়েছিল কুন্তলা।
-এই যে শুনছেন? দাঁড়ান...দাঁড়ান।
পেছন ফিরে সত্যকে আবিষ্কার করেছিল কুন্তলা। না, সে ঠিই ভেবেছিল, সত্যের অদল-বদল হয়নি। শুধু আরও একটু বেশি চেনা লেগেছিল ছেলেটাকে। কোথায় যেন দেখেছে? হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে, দু-একটা চেয়ারকে কিঞ্চিৎ হেলিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল।
-যাচ্ছেন কোথায়?
-ডঃ চৌধুরীর কাছে রিলিজ অর্ডার নিতে।
-যাচ্ছেতাই বলতে পারেন, সয়ে নেবেন আশা করি।
-উপায় নেই।
-চলুন।
বলেই ডঃ চৌধুরীর চেম্বারে ঢুকে পরেছিল সত্য। কুন্তলা ওর পেছনে। ডাক্তার চৌধুরী অভিজ্ঞ ডাক্তার। কুন্তলার কথা শুনে একটু চুপ করে বসে থাকলেন। তারপর খুব ধীরে ধীরে বললেন,
-নিয়ে যান, যখন আমাদের ওপর আর আস্থা রাখতে পারছেন না। তবে এ অসুখ সারবার নয় – এও বলে দিলাম। আপনাদের বাড়ির কাছাকাছি একজন নিউরোলজিস্ট আছেন, ডঃ অরিজিত ব্যানার্জী। একটা কোয়াপোরেটিভ হাসপাতালে বসেন বুধ আর শুক্র। আনঅফিশিয়ালি রেফার করলাম কিন্তু। ফোন নাম্বারটা সেভ করে নিন। মনে থাকে যেন, আনঅফিশায়ালি রেফার করছি।
চেম্বার থেকে বেরিয়ে বেশ আবাক লাগছিল কুন্তলার। ডঃ চৌধুরীর হঠাৎ এতটা উদার হয়ে গেলেন। তাঁর তো এভাবে উপকার করার কথা নয়। তবু করলেন। ভদ্রলোক সবকটা কথাই বলে যাচ্ছিলেন সত্যের দিকে তাকিয়ে। পনেরো হাজার টাকা ডাউন পেমেন্ট করল সত্য। রূপেশকে বাবা বাছা করে হাজার টাকায় রাজি করাল। শেখর ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করছিল। এদিকে বাবাকে আইসি.ইউ থেকে বার করে স্ট্রেচারে করে এনে গাড়িতে শোয়ানো হয়ে গেছে। গরম-ঠান্ডার বোধ কবেই টের পেতে ভুলে গেছে বাবা। সঙ্গে রাখা পাতাল গামছা ভিজিয়ে বার বার মুখের ঘাম হাত-পা মুছিয়ে দিচ্ছিল কুন্তলা। শেষ পর্যন্ত রিলিজ অর্ডার পাওয়া গেল। রাস্তায় প্রচন্ড জ্যামে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ছিল বার বার। অ্যাম্বুলেন্সেরও রেহাই নেই। কুন্তলা লক্ষ্য করছিল কী ভীষণ অভ্যস্ত হাতে তুলোর বান্ডিল থেকে তুলো বার করে, সেটাকে দুহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে পিজে জলে ভিজিয়ে বাবার মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিল সত্য। খবরের কাগজে বাতাস করছিল কখনও। নিজে থেকেই বলেছিল।
-এখানে ছিলাম না তো, খবরটা পাইনি। তোমাকে এত ছোটবেলায় দেখেছি একবার...বুঝতে পারিনি মাস্টারমশাই অসুস্থ। আগে যদি জানতাম...
-কী করতেন? এ অসুখতো ভালো হয় না।
-হতেও তো পারে। ডঃ চৌধুরী যার কাছে রেফার করলেন, সেখানেই প্রথমে নিয়ে গেলে ভালো হতো।
-আপনি চেনেন?
-হুম। আমাদের ওখানেও মানে পুরুলিয়াতেও ওরা একটা শাখা খুলেছে। তবু গরীব মানুষগুলোর কিছু চিকিৎসা হচ্ছে।
-আর ডঃ চৌধুরীকেও চেনেন?
বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল সত্য
-আমার নামটা কে রেখেছিল জান?
-কে?
-মাস্টারমশাই। সত্যকাম। ডঃ চৌধুরী বায়োলজিকালি আমার বাবা। কিন্তু মা বা আমি কেউই তার পরিচয়ে পরিচিত নই। দরকার হয়নি কখনও। যদিও মাস্টারমশাই জানেন না, আমি আমার পিতৃপরিচয় জানি। ভেবেছিলাম জানাব। সুযোগ পেলাম না।
-আজকের টাকাটা...

-ওটা নিয়ে না হয় আরেকদিন কথা হবে। মাস্টারমশাইয়ের একটা ব্যক্তগত আলমারি আছে। সম্ভবত তার চাবিটি উনি কাউকেই দেন না। তোমাকে হয়ত দিতেন। অনেক দুষ্প্রাপ্য বই আছে। সামলে রেখো।
-আপনি জানলেন কী করে?
-নিয়মিত চিঠিতে যোগাযোগ ছিল যে। ফোনে কথা হত। আমি আসতাম। মাস্টারমশাই যেতেন। কিন্তু তোমাকে একবারের বেশি দেখিনি। তাও ছোটবেলায়। তাই তুমি বলছি।
-বাবা সত্যিই বলত আমাকে এসব কথা। হয়ত এখনও বলে...
-নিশ্চয়ই। কতগুলো মিউজিক কনফারেন্সে পাওয়া টাকা আমাদের স্কুলটাকে দিয়েছেন। মায়ের চাকরিও মাস্টার মশাইয়ের দৌলতেই...

৩।
মাস্টারমশাইকে আর রাখা গেল না। তবে বাবার প্রত্যেকটা জিনিস কুন্তলা দুষ্প্রাপ্য ঐশ্বর্যের মতোই আঁকড়ে রেখেছে। চিরুনি, তেলের শিশি, তোয়ালে, দাড়ি কাটার, সামগ্রী, জুতো, জামা, ঘড়ি...সব কিছু। রেখে দিয়েছে তার ছাদের ঘরটাতে। যেন সেখানে এক রুগ্ন পিতা আজও তার ছোট মেয়ের আশায় শুয়ে আছে। বাবা তো কথা বলতে পারত না কুন্তলা। দলা পাকিয়ে কান্না ঠেলে বেরোত। আজও পারে না। তাছাড়া তখন চিকিৎসার খরচ যোগাতেই সব সুর কেটে যাচ্ছিল একে একে। তাদের মতো মফঃস্বলে টিউশানি করে কত আর আয় হয়? অর্ধেক তো টাকা মেরেই দেয়। আর ওর চাইতে ভীষণ লজ্জা করে। যদিও শেখরের কাছে চাওয়া হাজারটাকার নোটটা খুব বুদ্ধি করে ফেরত দিয়েছিল ও। রিসেপশানিস্ট সুন্দরী মেয়েটির হাতে টাকাটা দিয়ে বলেছিল,
-ডঃ শেখর রায়কে কাইন্ডলি টাকাটা দিয়ে দেবেন। তখন কথা বলার সময় উনার পকেট থেকে পড়ে গেছিল, খেয়াল করেননি।
কথাটা বলে ফেরার পথেই শেখরের নাম্বারটা ডিলিট করে দিয়েছিল আরও কতকি মুছতে শুরু করেছিল তখন থেকে। ডঃ অরিজিৎ ব্যানার্জীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে দেরি করেনি কুন্ডলা। নার্সিং হোম থেকে ফিরেই সে রাতে নিজে হাতে বাবার গা মুছিয়ে পাউডার লাগিয়ে দিয়েছিল, বিছানাটায় রবার ক্লথ পেতে নরম চাদর পেতে শুইয়ে দিয়ে ছিল তার পিতৃ সম্পর্কের পুত্রকে। রাতে যখন নিজে হাতে চামচ দিয়ে একটু একটু করে গলা ভাত খাইয়েছিল, বাবার মুখের আদলটাই বদলে গেছিল...যেন গান গেয়ে উঠবে। দুদিন পরেই সমবায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাবাকে। খুব যত্ন নিয়ে দেখেছিলেন ডক্টর ব্যানার্জী তবে আশার কথা শোনাতে পারেননি। দিন সাতেক সেখানে রেখে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। মাথা নীচু করে বলেছিলেন,
-মাস তিনেকের বেশি হয়ত থাকবেন না।
দিদি ডুকরিয়ে কেঁদে উঠেছিল। মা কান্নাকে ততদিনে গা মাওয়া করে ফেলেছে। তবু মৃত্যুর এই ঘোষিত ফরমানে সেই সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিতে ভুলে গেছিল মা, গোপাল-লক্ষ্মী-গণেশকে ঘুম পারাতেও ভুলে গেছিল। কুন্তলা কাঁদার অবকাশ পায়নি। দীর্ঘদিন স্কুল কামাইয়ের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ খুব ভদ্রভাষায় তাকে চাকরি বাঁচানোর শেষ সুযোগ দিয়েছিল। রোজ সকাল সাতটা থেকে ও বাবাকে বলতে শুরু করত
-বাবা, আমি আসি?
চেতনার নিঃশ্বাস নিঙড়ে সাড়ে নটার কাছাকাছি সময়ে বাবার একটা গোঙানো সম্মতি পেত ও। কান পেতে থাকত শব্দটা শোনার জন্য – যার অর্থটা শুধু ওই বুঝত-আচ্ছা, এসো, দীর্ঘ দিন চুল-দাড়ি কাটা হয়নি বাবার, একটা রবিবার দেখে দিদির আর ও বাবার দাড়ি গোঁফ, এমনকি চুলটাও কেটে দিয়েছিল। খুব বাজে কাটা হয়েছিল চুলটা তবু যেন বাবা সান্ত্বনা দিয়ে চোখের পাতা ফেলেছিল...হয়ত বুঝিয়েছিল বেড়ে গেলে আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। দিদি তখন ভুতানকে নিয়ে মাঝে মাঝে এসে থাকত। মায়ের কাছে কান্নাকাটি করত। কুন্তলা তখন বাবার জন্য আপেল সেদ্ধ করে পেস্ট করত। ওষুধের লিস্ট মিলিয়ে ওষুধ খাওয়াতে, রাতে বাবার জন্য সব্জি সেদ্ধ করে গলা ভাত করত...চামচ দিয়ে গলাভাত খাওয়াত বাবার মাথাটা বুকে তুলে, যেমন দিদি ভুতানকে খাওয়ায়। খাওয়াতে খাওয়াতে বাবাকেগল্প শোনাত কুন্তলা। শুধু গানটা শোনাতে পারত না। কিছু মনেই পরত না। রবি ঠাকুরের ছোটগল্প বাবার খুব প্রিয় ছিল। ছুটি গল্পটা শোনাতে শোনাতে তার মনে হতো বাবাও কি ফটিকের মতো অতল জলের মাপ নিচ্ছে...এক বাঁও মেলে না, দো বাঁও মেলে না। শিউরে উঠত ও। বাবার বুক আঁকড়ে বলত,
-আমাকে না বলে যেও না কিন্তু বাবা।
মা সহ্য করতে পারত না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে ফেলেছিল,
-আর টেনে রাখিস না রে। মানুষটাকে মুক্তিতে এবার। দেখতে পারছিস না? এতগুলো দিন ধরে কী কষ্ট পাচ্ছে। শুধু তোর টানেই যেতে পারছে না।

অবাক হয়ে চেয়েছিল কুন্তলা মায়ের দিকে। তবে কি তীব্র শোকই একমাত্র মানুষকে বীতশোক করতে পারে? বাবা তাকে বলেই গেছিল। আর কেউ শুনতে দমবন্ধ করে কুন্তলা মনে মনে বলেছিল,
-বাবা, সাবধানে যেও। আর তোমায় কষ্টদেব না।
আর কষ্ট পায়নি বাবা। রাত্রি শেষে বাবা ছুটি পেয়েছিল তার ছোট মেয়ের কাছ থেকে। ভোর না হতেই সত্যকাম ডক্টর ব্যানার্জী নিয়ে এসেছিল। ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে লিখতে বলেছিলেন ডাক্তারবাবু,
-আমি বলেছিলাম তিনমাস। তোমার সেবাই উনাকে ছমাস বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই সেবা বড়ো দুর্লভ।
শেষকৃত্য পাড়া-বেপাড়ার অনেকেই গিয়েছিল শ্মশানে। এর আগে কখনও সেভাবে মৃত্যু দেখেনি কুন্তলা। শ্মশানে গিয়ে দেখল সার সার মৃত্যু আড়ি পেতে রয়েছে...সবমৃত্যুই যেন শুনতে চাইছে,
-যাও, শান্তিতে যাও। সাবধানে থেকো
দাহকার্য করেছিল কুন্তলা। মুখাগ্নি করার সময় বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল – বাবার প্রিয় গানটা আর শোনানো হয়নি বাবাকে। তবু বুকের ভেতর থেকে উঠে আসছিল কথাগুলো-তোমায় গান শোনাব, তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ...। বাবাই হাতে ধরে শিখিয়েছিল গানটা। ঠাকুমা মারা যাবার পর, মাঝে মাঝেই বাবা ওকে শোনাতে বলত গানটা...বাবাকে শোনানো হলো না। গভীর রাতে সব রাগ-রাগিনী চির অস্তাবলে...তখন তার না আছে ভৈরবী, না আছে ইমন-কল্যান.
গঙ্গাস্নান করার আগে বাবার খড়ের দেহকে হাতের মধ্যে ধরে কাঁপছিল কুন্তলা। পুরোহিত পাশ থেকে বলে যাচ্ছিল।
-তোমার বাবা সূক্ষ্মদেহে রয়ে গেছেন। কষ্ট পাচ্ছেন। ওনাকে মুক্তি দাও। যেভাবে বাবাকে আদর করে খাওয়াতে, মাথায় হাত বোলাতে, তেল মাখাতে, সেইভাবে...
বাকি কথাগুলো আর শুনতে পারেনি কুন্তলা। জীবনকাকু তাদের দুই বোনকে শক্ত হাতে গঙ্গা স্নান করাতে নেমেছিল। দিদি হাঁটুজলেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সে একাই নেমে ডুব দিয়েছিল। তবু তার একটা হাত ধরে রেখেছিল আরেকটা হাত। একবছর হয়ে গেল। তবুও যেন শেষ কৃত্য সমাপন করতে পারেনিও। ক্রমাগতই মনে মধ্যে শেষকৃত্য চলতে থাকে-এর বুঝি কোনো অন্ত নেই। আজও সে মুখাগ্নি করেই চলেছে, প্রতিটা মুহূর্তের কাতর আবেদনকে বলে,
-যাও...শান্তিতে যাও।
ভেজা শাড়িটা ছেড়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল কুন্তলা। ভীষণ গা-হাত পা ব্যথা করছে, বোধহয় জ্বর আসছে।

৪।

দেখতে দেখতে পুজো চলে এল। মহালয়ার দিন তর্পণ করল কুন্তলা। দিদি এবার পুজোয় আসতে পারবে না। অন্তুদা ছুটি পাবে না। ষষ্ঠীর দিন মাকে নিয়ে ভোরের ট্রেন ধরবে কুন্তলা। জীবনকাকু কদিন থাকবে এ বাড়িতে। যা দিনকাল, তাতে ফাঁকা বাড়ি রেখে যাওয়া যায় না। মা অবশ্য ওর গন্তব্যের আসল কারণটা জানে না, হয়ত জানবেও না কোনোদিন। দিদিরা নাসিক যাওয়ার পর পর বাড়িটায় টিকতে পারত না ওরা। সেদিন রবিবার ছিল, সারা বাড়ি পরিষ্কার করার পর। দুপুরে খেয়ে উঠে নিজের ঘরটা নিয়ে পড়েছিল কুন্তলা। কতদিন পরিষ্কার করা হয়নি। বাৎসরিক কাজের দিন, সত্যকাম ওকে বাবার আলমারির ডুপ্লিকেট চাবিটা দিয়ে বলেছিল,
-মাস্টারমশাই চাবিটা আমার কাছে রেখেছিলেন। আলমারিটা খুলে দেখো...
-কেন বলুন তো বার বার বলেন?
আলমারিটা খুলে দেখ, বুঝতে পারবে।
নিজের বইয়ের তাক গোছাতে গোছাতে এস. এস. সির বইগুলোর দিকে ক্লান্ত চোখে তাকাচ্ছিল কুন্তলা। কতবার চেষ্টা করেছে পড়াশেনায় মন দিতে-এস. এস. সিটা পেতেই হবে। তিন-তিন বার দোরগোড়া থেকে সে বাতিল হয়েছে। সেই জেদটাই আর নিজের মধ্যে খুঁজে পায় না ও। সোকেসের ওপর রাখা চাবির বাক্সটার দিকে চোখ পড়তেই বাবার আলমারির চাবিটা তুলে নিয়েছিল ও। বাবার ছবিটার সামনে গিয়ে বলেছিল,
-তোমার বইয়ের আলমারিটা গুছিয়ে দিচ্ছি বাবা। উই ধরবে যে। রাগ করে না কেমন?
আলমারিটা খোলামাত্র ন্যাপথালিনের গন্ধ নাকে লাগল কুন্ডলার। শুধু বই নয়, ডাইরি, ফাইল, কলমদানি কত, কিছু গচ্ছিল রেখে গেছে বাবা। কয়েকটা বই উল্টে পাল্টে দেখতে গিয়েই হোঁচট খেলো কুন্তলা। প্রত্যেকটা বইয়ের প্রথম পাতায় লেখা – মাস্টারমশাইকে সত্যকাম। এত ভালোবাসত বাবা সত্যকামকে? তার থেকেও বেশি? নাহলে এত অধিকারবোধ আসে কোথা থেকে? এই আলমারিটা সত্যকাম ছাড়া আর কেউ খুলতে পারত না তাদের মধ্যে, কারণ ডুপ্লিকেট চাবিটা শুধু ওর কাছেই ছিল। ভীষণ অভিমান হচ্ছিল কুন্তলার। বাবার সঙ্গে তো এ নিয়ে এখন আর ঝগড়াও করা যাবে না। কমপক্ষে পঞ্চাশখানা বই সত্যকাম বাবাকে দিয়েছে, সবকটাই দুষ্প্রাপ্য। ও কি এগুলো ফেরত চায়? তারজন্য বইগুলোর কথা বার বার মনে করিয়ে দেওয়া? নিজেই নিয়ে নিতে পারত – কুন্তলা

বাধা দিত না, বাবা সেই অধিকার তাকে দেয়নি। বইগুলো গুছিয়ে রেখে ফাইলগুলো নামাল, পোক্ত কাভার ফাইল। সব কটার ওপরেই লেখা সত্যকামের জন্য। চোখ দুটো জ্বলছিল কুন্তলার, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল কুন্তলার। মাথার শিরাগুলো দপ্‌দপ্‌ করছিল। ফাইলগুলো ঝেড়ে পুছে রেখে দিল কুন্তলা। সত্যকামকে দিয়ে দিতে হবে। একটা একটা করে ডাইরির পাতা ওল্টাচ্ছিল কুন্তলা। বেশিরভাগই শ্বরলিপি লেখা। নয়ত রাগ-রাগিনীর উদ্ভব সম্পর্কিত টীকা। একটা খেলা চিঠি লুকিয়েছিল ডাইরির পাতার মধ্যে। নিজেকে আর সামলাতে পারেনি কুন্তলা। পড়তে শুরু করল...

সত্যকাম,

তোমার মা আজ বেঁচে থাকলে, তিনিই হয়ত তোমাকে রবীন্দ্রদীক্ষা দিতেন। আমার থেকে আরও গভীর ছিল তার উপলব্ধি। আশ্চর্য নিমগ্নতা ছিল যামিনীর। ও নিজেকে সমর্পন করতে পারত, নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে। এই সমর্পন ব্যতীত এই দীক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সে আমার ছেলেবেলার গ্রাম সম্পর্কের বোন। তবু বরাবরই ডাকত মাস্টারমশাই বলে. তোমাকেও শিখিয়েছে সেই একই ডাক। আমি বড়ো দ্বিধায় পড়ি, যখন তুমি আমার কাছে আস রবিঠাকুর নিয়ে। তোমার মধ্যে অন্বেষণ আছে, একদিন নিজেই খুঁজে পাবে তাঁকে। তাই তোমার এই অকপট নিষ্পাপ নির্ভরতায় বড়ো লজ্জা পাই। যামিনীকে আমি পূজারিনী বলতাম। ও আপত্তি করত খুব। বড়ো কম বয়স থেকেই এক নামহীন সম্পর্ক রচিত হয়েছিল, হয়ত সেই সম্পর্কের সংজ্ঞাকেই যামিনী খুঁজেপেত মাষ্টারমশাই ডাকটার মধ্যে। তোমার বোধ গভীর, মন শান্ত। জীবনই তোমাকে এ পাঠ দিয়েছে। তাই এই মাস্টারমশাই এর সঙ্গে তোমার মায়ের বা তোমার সম্পর্ক নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয়। বোধহয় এই ধরনের নামহীন মানবিক সম্পর্কগুলিই মানুষের সঙ্গে মানুষের সেতু নির্মাণ করে। রবি ঠাকুরের গানে বারে বারে খুঁজে পাই সেকথা। এখন কুন্তলার মধ্যে মাঝে মাঝে পূজারিনীকে খুঁজে পাই বড়ও বেশি করেই পাই। ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম তোমাদের ওখানে। তুমি সেদিন কী কাজে যেন কোলকাতায় এসেছিলে। দেখা হয়নি। ছোটবেলায় নবীনপল্লীর বাড়িতে এক-দুবার দেখে থাকতে পারে। পুরুলিয়ায় যখন নিয়ে গিয়েছিলাম কুন্তলাকে, তোমার মা চেয়ে রেখেছিল ওকে। আসি কথা দিইনি। কারণটা আন্দাজ করতে পারবে। তোমরা বড়ো হয়েছ, পরিণত হয়েছে সিদ্ধান্ত তোমরাই নেবে। আমি কুন্তলাকে কিছু বলিনি। আমার আলমারির চাবিটা তোমাকে দেওয়া আছে। সেতু নির্মিত হলে ঘরের চাবি ভেঙে নিয়ে যেও ওকে। পুরুলিয়ার পাঁচকাঠা জমি তোমার মায়ের কথা মতো তোমার নামে করিনি, স্কুলটির নামেই আছে। কথাগুলি এখনই বলা দরকার বোধ করছি। তোমার পিতৃপরিচয় আমার জানা। কিন্তু সে কথা তোমাকে জানানোয় শ্রেয় দেখিনা। সত্যকামের তো সে পরিচয়ের প্রয়োজনও হয়নি কোনোদিন। তবু যদি একান্তই জানতে চাও, আমার বাড়িতে এসো। আমার বইয়ের আলমারির লকারে তোমার মা-বাবার বিয়ের চিঠিটা রাখা আছে। নিজে হাতেই নিয়ে নিও। তোমাকে মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত করে সে পলাতক হয়েছিল। আজ আর তার সন্ধান রাখি না। পূজাবিনী নিষেধ করেছিল। তুমি সাহিত্যিক মানুষ। বোধিসত্বের আড়ালে তোমার লেখা নিবন্ধগুলি আমার অনুধ্যানকে স্পর্শ করে যায়। মজার কথা শিখি তোমার কাছ থেকে, আর আমায় ডাক মাস্টারমশাই – ভারি মজার উলটপুরাণ। আমার প্রতি তোমার আবাল্য অবিচল শ্রদ্ধার কাছে মাথা নত করে স্বীকারোক্তি করে গেলাম। চিঠিটা তোমার হাতে দিতে বড়ো কুন্ঠা হচ্ছে। যামিনী বেঁচে থাকলে তার হাতে দিয়ে আসতাম। ডাকযোগে পাঠাবো না – হাতের স্পর্শ না থাকলে এ চিঠিটা সম্পূর্ণ হয় না। অফিস ফেরত চলে যাব তোমার ওখানে, তোমার মুম্বাই যাবার আগে। দলিল সহ অন্যান্য সবিনাপত্র গুলিও সেই সঙ্গেই পৌছে দেব। ইদানীং শরীর বড়ই বিদ্রোহ করছে। লুকিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছি, স্নায়ুতন্ত্রে তুমুল ঝড় উঠেছে। বুঝতে পারছি, কর্তব্যগুলো একে একে সারার সময় এসে গেছে। আর দেরি করা যাবে না। শুধু কুন্তলাকে বোঝাবার দায়িত্ব তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি-তাকে আমার এইসব কথা বলার মনোবল নেই আমার, মেয়েটার কাছে বড়ো দুর্বল তার বাবা। সুস্থ থেকো।

আশীর্বাদক
মাস্টার মশাই

কুন্তলা লকারটা খুলে প্লাস্টিকে মোড়া জীর্ণ-অর্থহীন বিয়ের চিঠিটা বার করেছিল। বাবার অসমাপ্ত কাজটা তাকেই করতে হবে। এখনও শেষ হয়নি শেষকৃত্য। সত্যকামকে লেখা চিঠির তারিখটা লক্ষ্য করেই বোঝা যাচ্ছে বাবা আর সময় পায়নি। সেই রাতেই অজ্ঞান হয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়েছিল বাবা।

মা যামিনী পিসিকে সুরোঝি ডাকে। এই ডাকগুলো কি হারিয়ে যাবে মানুষগুলোর সঙ্গে সঙ্গে? কী সহজ সুস্থ সম্পর্ক মানুষগুলোর মধ্যে। এদের মাঝে থাকলে কুন্তলার মনে হয় বিশুদ্ধির অবগাহনে পুন্য হচ্ছে ওর জীবন। জমির দলিলসত্য কামকে দিতে পুরুলিয়া যাবার প্রস্তাবে মা এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল। হয়ত মনে প্রশ্ন ছিল মুখ ফুটে

বলেনি কিছু। অথবা বাবা মায়ের কাছেও রেখে গেছে কোনো ইঙ্গিতবাহী আলেখ্য। স্টেশানে সত্যকাম দাঁড়িয়েছিল। জায়গাটাও অল্প বদলেছে, ...বেশি নয়। সারাটা রাস্তা আসতে আসতে মনে হয়েছে কুন্তলার বাবা তার পাশে পাশে এসেছিল। স্কুলবাড়িটা পাকা হয়েছে। তিনটে ট্যাঙ্কে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন পুজোর ছুটি বলে ইস্কুল ফাঁকা। যামিনী পিসির বাড়িটা একই আছে...লালচে মাটির দোতলা বাড়ি। মা দীর্ঘ অনভ্যাসে খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল। যেন এমনটার জন্য প্রস্তুত ছিল সত্যকাম। লেবু-চিনির সরবৎ খেয়ে ধাতস্ত হলো মা। স্নান করে খেয়ে খুমিয়ে পড়ল একতলায়, সত্যকামের ঘরে।

সত্যকামকে তার একা পাওয়া খুব দরকার। আমানত আর বইতে পারছে না কুন্তলা। রাতে খাওয়ার পর, হয়ত সময় আসল সময়ের। দোতলার ঘরটা যামিনী পিসির আগের বাবা এসে ওখানেই ছিল। হ্যারিকেন হাতে উঠে এল কুন্তলা, কাঁধে তার আমানতের ঝোলা। সত্যকাম এমার্জেন্সি আলো জ্বালিয়ে কী একটা লিখছিল। কুন্তলা কোনোরকম ভূমিকা না করেই বলল,
-আগেরবার এসে এই ঘরটাতেই ছিলাম।
-এবারো থাকবে। বোঝাপড়াটা হয়ে যাক, তারপরেই না হয় মাসিমাকে ডেকে এনো। ঘুমিয়ে পড়েছেন?
-দরকার হবে না। আমরা নীচের ঘরে থেকে যাব। আপনার অতিয়েত্থতার নিন্দে করব না।
-দরকারও হবে না। দাও কী দেবে?
-কীকরে জানলেন কিছু দেব?
কুন্তলা একে একে সব বার করে দিল। সব শেষে দিল বাবার চিঠিটা আলমারির চাবিটা টেবিলের ওপর রাখল। সত্যকাম চিঠিটা পড়ল খুব মন দিয়ে। ওর দিকে বাড়িয়ে বলল,
-পড়া আছে? আরেকবার পড়ো।
-বাকি দলিল দস্তাবেজের ভার আমার নয়। আর চিঠিটা পড়ার জন্য ক্ষমা চাইছি।
-কেন? ভালো করেছতো। এরকম একটা কিছু পড়বে বলেই তো চাবিটা দিয়ে এসেছিলাম হাতে।
-কেন? আমি...
-আমার আশ্রয়। আত্মগোপন করার একটা জায়গাতো থাকা চাই যে। মাস্টারমশাই চলে গেলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার মায়ের পূজারিনী কি আমায় সেই জায়গা দেবে?
একটা আকুল করা হাহাকার ভেজা গলা দিয়ে বেরিয়ে আসল কুন্তলার,
-আমি পূজারিনী নই...কোনো সমর্পন নেই আমার...বাবা চলে যাবার সময়ও কিছু গাইতে পারিনি...বাবা কতবার...কোনো নিবেদন নেই আমার।
-আমিযে নিজে চোখে দেখেছি। মাস্টারমশাই সবটুকু সমর্পনেই পূর্ণ হয়েছেন...আমি দেখেছি।
-বাবার শেষ কৃত্য যে এতদূর টেনে আনবে ভাবিনি। যাক, আপনার গচ্ছিত যা কিছু যা কিছু দিয়ে গেলাম।
-ভুল বললে। পাথেয়টুকু দিলে। গচ্ছিল যা, তাকে দিলে কোথায়?
কুন্তলা আর দাঁড়াতে পারছিল না। ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ল...
বাইরে অকালবৃষ্টি নামল। সত্যকাম কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল মনে নেই কুন্তলার...কত কত কত দিনপর ও দেখল বাবা বিশু পাগলের গানটা গাইছে...গলায় অচেনা হয়ে যাওয়া গানটা ভেসে উঠল...তার সামনে আরেক বিশু পাগল উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে...ভাঙাচোরা রাতে গান শুনল পুরুলিয়ার সেই বনপাহাড়ী

এল আঁধার ঘিরে, পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে...
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় না কো
ওগো দুখজাগানিয়া...
তোমায় গান শোনাব...